আমাদের প্রকাশিত বই

১. ল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (১৯৯২)।
২. দ্য ইগনোরড্ এনভায়রনমেন্ট, উপেক্ষিত পরিবেশ (১৯৯৮)।
৩. রণনীতি ও রণকৌশলের ইতিহাস (২০০৩)।
৪. অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী : ফিরে দেখা (২০০৩)।
৫. পরিবেশ (২০০৩)।
৬. ধূসর বসুধা (২০০৩)।
৭. এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়েকনিং (২০০৫)।
৮. এত আঁধার কেন (২০০৮)।
৯. প্রসঙ্গ : যুদ্ধ ও পরিবেশ (২০০৮)।
১০. প্রসঙ্গ : মানবাধিকার ও পরিবেশ (২০০৮)।
১১. শিকড়ের সন্ধানে: হুগলি জেলা (২০০৯)।
১২. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ফিরে দেখা (২০০৯)।
১৩. জলবায়ু পরিবর্তন : এক অশনি সংকেত (২০০৯)।
১৪. সবুজ বিশ্বের শান্তির অধিকার (২০১০)।
১৫. রবীন্দ্রমননে প্রকৃতি ও পরিবেশ (২০১১)

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক : পরিবেশ অ্যাকাডেমি ও সবুজের অভিযান, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬। সম্পাদক : রাহুল রায়।
যোগাযোগ : ৯৪৩৩৫৭৫০৬৪; ৯৮৩৬২০৮০০৩
ই-মেল : rayrahul2263@yahoo.co.in

সবুজ ইস্তাহার

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

বর্ষ : ৩ সংখ্যা ৯ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১১ দাম ৫ টাকা

সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও পরিবেশবিদ অধ্যাপক সত্যেশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রয়াত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ আন্দোলনের এক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বকে হারাল। আমরা শোকস্তব্ধ। পরিবেশ মেলা উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সবুজ ইস্তাহার আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সত্যেশচন্দ্র চক্রবর্তী স্মরণে নিবেদিত।

আমাদের কথা

গঙ্গার পশ্চিমকূলে হুগলি জেলায় চন্দননগর শহর। এই শহরে ১৯৪৭ সালে জন্ম নেয় 'সবুজের অভিযান'। সরস্বতী পূজার হাত ধরে বড়বাজারের কয়েকটি ছেলে সবুজের অভিযান-এর জন্ম দেয়। তারপর থেকে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। অনেক প্রজন্ম সবুজের অভিযানকে দেখেছে আর তার আবর্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। ১৯৮০-র দশকে বিশিষ্ট অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তী সবুজের অভিযানকে নিয়ে একটি ছোট লেখা লেখেন, সেখানেই সবুজের অভিযানের চরিত্র মূর্ত হয়ে ওঠে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর ভাষায়, 'বড়বাজারে সবুজের অভিযানের ছোট খেলার মাঠে পাড়ার ছেলেদের কত উৎসাহ, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা। গোটা কয়েক বাড়ির মাঝখানে মাথা গুঁজে পড়ে আছে একফালি সবুজ। এখানে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন গাঢ় হয়ে আসে, তখন পাড়ার ছেলেরা গোল হয়ে বসে স্বপ্ন দেখে। রাত হয়। ওরা বাড়ি ফিরে যায়। আর দাদিদিদের

উজ্জ্বল কুয়াশার মতো জমাট স্বপ্ন মাঠের সবুজকে আঁকড়ে পড়ে থাকে। মাঠের এই জমাট স্বপ্ন থেকেই উঠে এসেছে অনেক ব্যক্তিত্ব যারা সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করেছে আর গর্ব করে বলে আমি সবুজের অভিযান। সবুজের অভিযানের নিজস্ব একটা উপলব্ধি আছে। যে উপলব্ধি ছেলেদের ধরে রেখেছে আর তাদের একসূত্রে গ্রথিত করেছে। খেলাধুলা, ছোট বড় নানা কাজে জোট বেঁধে মানুষের সেবা, মরা পোড়ানো, পিকনিক —এই সব নিয়ে মিলেমিশে থাকার জন্য সকলের অজ্ঞাতসারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্ম হয়। এই চেতনাই সবুজের অভিযানের সম্পদ।' সবুজের অভিযানের রাজ্যে সবাই রাজা রাজার রাজত্বে, নইলে মোরা মিলবো কী শর্তে। সবুজের অভিযানের সবাই এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত।

তারপর অনেকটা সময় কেটে গেছে। সবুজের অভিযানের সভ্যরা ক্রমশ তাদের একফালি মাঠকে সাজিয়ে তুলেছে নানাভাবে। আজকে ক্লাব বিল্ডিং গড়ে হয়েছে, গড়ে উঠেছে পরিবেশ অ্যাকাডেমি, অধ্যাপক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত সভাগৃহ সহ নানাবিধ কর্মকাণ্ডের জোয়ার। চন্দননগরের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব প্রয়াত ভবানী মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে সবুজের অভিযান পরিবেশ আন্দোলনের সহযাত্রী হয়ে পড়ে। ক্রমে তার কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে পরিবেশ বিষয়ক নানা কাজকর্ম, যেমন - পরিবেশ মেলা, পরিবেশ বিষয়ক বই প্রকাশ এবং পরিবেশ অ্যাকাডেমিতে পরিবেশ নিয়ে নানা সেমিনার ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য পরিবেশ সচেতনতার পঠনপাঠন।

আজ সবুজের অভিযানে অঙ্ক শিক্ষা, নৃত্য শিক্ষা সহ যোগাসনের আয়োজন করা হয়েছে। এমনকী সবুজের অভিযানের নামে অ্যাম্বুলেন্স ও শববাহী গাড়ির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই সব কিছুর মধ্যে সবুজের অভিযান আজ বেঁচে আছে সেই চেতনা নিয়ে যেখানে নবীন প্রাণের অহেতুক আনন্দ সব অভাবকে পূরণ করে, সবাইকে একই সূত্রে ধরে রাখে, আর তাদের শেখায় নতুন কিছু করে দেখানোর আনন্দ।

বিশিষ্ট কিছু চিন্তাবিদের মননে পরিবেশ

রাহুল রায়

আমাদের এই পৃথিবীর এখন ভারী অসুখ। জলে-জমিতে-বাতাসে নানান দূষণে ও উষ্ণায়নে সে বড়ই বিপন্ন। তার জলবায়ু গেছে বদলে। পৃথিবীর এই বিপন্নতার ছাপ পড়েছে তার গাছপালা ও পশুপাখির ওপরে। এমনকী মানুষও এর থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আসলে জেমস ওয়াট যেদিন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করলেন আর তার কালো ধোঁয়া বাতাসে গেল ছড়িয়ে, সেদিন থেকেই অজান্তে মানুষের তৈরি দূষণ প্রকৃতিতে পা দিল। বর্তমান পৃথিবীর পরিবেশ বিপন্নতা নিয়ে বিজ্ঞানীরা তো বটেই, সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক সবাই কমবেশি চিন্তিত। অতীতেও বেশ কিছু মানুষ প্রকৃতি-পরিবেশ নিয়ে গভীর ভাবে ভেবেছেন। নানা বিষয়ে আমাদের সতর্কও করেছেন। কিন্তু আমরা তাঁদের সেসব ভাবনা বা সাবধান বাণীতে কান দিইনি। দিলে নিশ্চিতভাবে আমাদের একমাত্র প্রাণময় গ্রহটির আজ হয়তো এই দশা হত না। যদিও অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে তবুও বর্তমান এই ছোট রচনায় তেমন কিছু ভাবনাকে খুবই সংক্ষেপে তুলে ধরার এক চেষ্টা করা হয়েছে যা এখনও খুবই প্রাসঙ্গিক। মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় বিপদ রুখতে এঁদের ভাবনাকে আমাদের সকলের মধ্যে ভাগ করে নিতেই হবে।

গৌতম বুদ্ধ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা সিদ্ধার্থ নেপালের কপিলাবস্তু শহরে এক রাজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন খ্রিস্টজন্মের পাঁচশ বছর আগে। তাঁর সারা জীবনের নানান কাজে চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রেরণা জুগিয়েছিল। উল্লেখ করার মতো বিষয় হল যে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন গাছের তলে, বোধিলাভ করেন

গাছের তলে, এমনকী দেহত্যাগও করেন গাছের তলে। প্রকৃতির সঙ্গে এমন নিবিড় সখ্য খুব কমই দেখা যায়। বুদ্ধদেব গাছ কাটা একেবারেই পছন্দ করতেন না। 'অঙ্গুত্তরা নিকায়া'য় তিনি বলেছেন — এটি কতখানি আশ্চর্যের 'মানুষ এমন দুষ্ট যে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেবার পর গাছের ডাল কাটতে একটুও দ্বিধা করে না।' তাঁর সময়ে গাঙ্গেয় উপত্যকায় প্রচুর গাছপালা কাটার জন্য তিনি মূলত বাণিজ্যিক নগরায়ন এবং ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণির উদ্ভবের কথা বলেছেন। এমনকী সেই সময়ের কৃষি অর্থনীতিও অরণ্যহননের জন্য দায়ী বলে তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

গৌতম বুদ্ধ যেসব ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন তাতে প্রাণী জগতের প্রতি, বিশেষ করে পাখি ও পশুদের ওপর তাঁর ভালবাসা দেখা যায়। আমরা জাতকের গল্পে পাখি ও অন্যান্য পশুদের মাঝে বুদ্ধের জীবনকাহিনিকে দেখতে পাই। বৈদিক যুগে আর্য জাতিরা পুজোআচ্চায় পশুবলি দিত। চাষবাসে ও যুদ্ধে পশুদের খাটাত। বুদ্ধ ভারতীয় সভ্যতায় এই বিষয়ে মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্কের পুনর্মূল্যায়ন করেছিলেন। প্রকৃতি যে কোন ভয়ের উৎস নয়, বরং জীবজগতের বেঁচে থাকার অনুকূল এক ব্যবস্থা তা তিনি মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেবের নানান বাণীতে প্রাকৃতিক নান্দনিকতার পরিচয় স্পষ্ট। তিনি পৃথিবীতে সকল জীবের মধ্যে পারস্পরিক এক নির্ভরশীলতার কথা বলে গেছেন।

অ্যারিস্টটল

খ্রিস্টজন্মের ৩৮৪ বছর আগে ম্যাসিডন-এ অ্যারিস্টটল জন্মেছিলেন। যদিও অ্যারিস্টটল পরিবেশ বিজ্ঞানী ছিলেন না, এমন কী বর্তমানের ভয়ানক পরিবেশ সংকটও তাঁর সময়ের দিনে দেখা যায়নি, তবুও জীবজগৎ ও প্রকৃতির

প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ কিছু চিন্তা বর্তমান কালের পরিবেশের পক্ষেও প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, অ্যারিস্টটল প্রাকৃতিক জগতের প্রতিটি উপাদানকে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এক সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। এদের মধ্যে তিনি কোন বিচ্ছেদ খুঁজে পাননি, বিশেষ করে মানুষ ও না-মানুষী জগতে। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছিলেন যে প্রতিটি প্রাণীরই বিকাশ ঘটে তার বিনাশ বা শেষের জন্য এবং এই বিনাশ প্রাণী প্রজাতিটির পক্ষে ভাল। তিনি আরও বলেছিলেন যে মানুষের পার্থিব জগতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই থাকা উচিত। আর কে না জানে বর্তমান ভোগবাদের যুগে প্রকৃতি-প্রজাতি-সম্পদ টিকিয়ে রাখতে এই নিয়ন্ত্রণ কী ভীষণ জরুরি। তাই বর্তমানের কট্টর পরিবেশবাদীরাও অ্যারিস্টটলের এসব চিন্তাকে গুরুত্ব দেন। অ্যারিস্টটল গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন 'সমস্ত প্রাকৃতিক জিনিসের মধ্যেই রয়েছে কিছু বিস্ময়' ('In all natural things there is some thing wonderful'.— Parts of Animals)।

ফ্রান্সিস বেকন

রাজনীতিক, প্রকৃতি বিজ্ঞানী, সমালোচক-লেখক বেকন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৫৬১ সালে। গোটা জীবনটাই তিনি কাটিয়েছেন রানি এলিজাবেথ ও রাজা প্রথম জেমস্-কে ঘিরে থাকা সর্বোচ্চ স্তরের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। বেকন প্রাকৃতিক শক্তিকে গভীরভাবে মানতেন। তিনি বলেছিলেন যে কেবল তখনই প্রকৃতির ওপর খবরদারি করা চলে যখন তার অপরিবর্তনীয় কাঠামো বা স্বরূপটিকে গভীরভাবে যথাযথ বুঝতে পেরে মানুষের মঙ্গলের জন্য তাকে রূপ দেওয়া হয়। প্রকৃতির নিয়মগুলিকে মানুষকে যথাযথ মানতেই হবে যদি সে নিজের কাজে প্রকৃতিকে লাগাতে চায়। আর যদি এই নিয়ম সে ভাঙে, তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। এ বিষয়ে বেকনের

বিখ্যাত উক্তি — 'Nature to be commanded must be obeyed; and that which in contemplation is as the cause is in operation as the rule' (The New Organon).

বেনেডিক্ট স্পিনোজা

আমস্টারডম শহরে ১৬৩২ সালে স্পিনোজা এক ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্পিনোজা তাঁর দর্শন চিন্তায় এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের কী স্থান তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। মানবজীবনের নানান অভিজ্ঞতার প্রতিটি দিক এই চিন্তায় এক বৃহৎ সমগ্রের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমান কালের নানান পরিবেশ ভাবনা স্পিনোজার দর্শনচিন্তা থেকে রসদ পায়। স্পিনোজার দর্শনচিন্তার প্রকৃতি বা পরিবেশ কেবল যান্ত্রিক বিজ্ঞানের মতো গুণমান-নিরপেক্ষ কোন জড়, বা নিষ্ক্রিয় বিষয় নয়। বরং এক সৃষ্টিধর্মী, অসীম বৈচিত্র্যের অধিকারী, সজীব এবং আমাদের চারপাশের সবকিছু নিয়ে গড়ে ওঠা এক ব্যবস্থা। সমস্ত রকম জীবনযুদ্ধে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে গেলে স্পিনোজা প্রকৃতির নিয়মের প্রতি নম্রতা ও অনৈতিকতার মধ্যে এক সুসামঞ্জস্য বজায় রেখে চলতে বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে ভবিষ্যৎ মানবসমাজ প্রকৃতিতে তখনই সুস্থিত হবে যখন সে এই নম্রতা ও অনৈতিকতার মধ্যবর্তী কোন তৃতীয় পথ বেছে নিতে পারবে। স্পিনোজার মতে এই বিশ্বের প্রতিটি বস্তু অন্য আর একটি বস্তুর সঙ্গে এক সম্পর্কে বাঁধা রয়েছে। কোন কিছুই অকারণে অক্ষম নয়। কারণ ছাড়া কোন কিছুই ঘটে না। প্রতিটি বস্তুই তার পরিবেশ গঠনে তার ধর্ম বা স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করে। প্রতিটি বস্তুর এরকম আচরণকে স্পিনোজা ঈশ্বরের চরম পূর্ণতা বা শ্রেষ্ঠতা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে 'সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মন একাত্ম হয়ে যে জ্ঞান বা ধারণা জন্মে তা-ই পরম শুভ' (সূত্র: On the Emendation of the Intellect)।

টমাস রবার্ট ম্যালথাস

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, অংক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ইংরাজ পাদরি টমাস রবার্ট ম্যালথাস জন্মেছিলেন ১৭৬৬ সালে। আঠারো শতকের শেষ দিকে শিল্প বিপ্লবের আগে ব্রিটেনের আর্থিক ও সামাজিক চেহারাটি ম্যালথাসকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছিল। সে সময় ব্রিটেনে গ্রামীণ শিল্পগুলি ভেঙে পড়ছিল, কিছু গ্রামে ক্রমশ জনসংখ্যা কমে আসছিল, ফাঁকা অঞ্চলগুলি বদলে গেল ঘেরা জায়গায়, রপ্তানি বন্ধ হয়ে ভুট্টার আমদানি বাড়ল, শহর বাড়তে লাগল, সেখানে শিল্পায়নের কিছু প্রাথমিক আভাস দেখা গেল এবং জনসংখ্যাও বাড়তে থাকল। ফলে মানুষের দুঃখদুর্দশাও বাড়ল। এসব দেখে ম্যালথাসের মনে হল যে দারিদ্র ও দুঃখই হল মানুষের এমন এক ভবিতব্য যাকে সে কিছুতেই এড়াতে পারে না। তিনি বুঝেছিলেন যে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের জীবিকার প্রয়োজন খুবই জরুরি। ম্যালথাস লক্ষ করেছিলেন যে মানুষ যে পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য পায় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে ক্রমাগত তার প্রজাতি বাড়িয়ে চলেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও তার উপনিবেশগুলিকে উদাহরণ হিসাবে ধরে তিনি বললেন যে জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে; প্রতি ২৫ বছরে এটি দ্বিগুণ হবে। কিন্তু এই একই সময়ে খাদ্যদ্রব্য খুব বেশি হলে বাড়বে গাণিতিক পদ্ধতিতে। ফলে, জনসংখ্যা ও খাদ্যদ্রব্য বাড়ার এই তফাতটিই জনসংখ্যার পরিমাণ অপরিমিত হওয়ার ক্ষেত্রে এক বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কেন না খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতির ফলে দেখা দেবে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র, নানান রোগ-ব্যাধি, সামাজিক অস্থিরতা, যুদ্ধ ইত্যাদি। এসব থেকেই বাড়বে মৃত্যু হার যা স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক নয় কারণ প্রকৃতিতে আর পাঁচটা প্রজাতির মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য বিকল্প হিসেবে তিনি ঐচ্ছিকভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন।

ম্যালথাস তাঁর এই চিন্তাধারা ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'An Essay on the Principle of Population as it affects the Future Improvement of Society' তে বলে গেছেন। নিচে তাঁর সেই প্রবন্ধের কিছু বিখ্যাত অংশ হুবহু তুলে দেওয়া হল যা থেকে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

> I think that I may fairly make two postulata. First, that food is necessary to the existence of man.
> Secondly, That the passion between the sexes is necessary and will remain nearly in its present state.
> Assuming then my postulata as granted, I say, that the power of population is indefinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for man.
> Population, when unchecked, increases in a geometrical ratio. Subsistence increases only in an arithmatical ratio.
> A slight acquaintance with numbers will shew the immensity of the first power in comparison of the second.

ম্যালথাসের মূল বক্তব্য ছিল যে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ এশিয়া সহ ইংরাজি ভাষায় কথা বলা দেশগুলিতে এ ঘটনা দেখা গিয়েছিল। এখন পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭০০ কোটি ছাড়িয়েছে। তিসরি দুনিয়ার দেশগুলিতে রয়েছে ভয়ানক দারিদ্র। বাঁচার জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে সেই সব প্রাকৃকি সম্পদ ক্রমাগত ব্যবহার করে চলেছে যাদের জোগান অত্যন্ত সীমিত। মানুষের নানান কাজের কুপ্রভাব গিয়ে পড়ছে প্রকৃতি-পরিবেশের ওপর। অতীতে পৃথিবীর তুলনায় জনসংখ্যার অনুপাতটি

যখন আপেক্ষিক ভাবে কম ছিল, তখন মনুষ্যসৃষ্ট মূলধন ছিল কম। প্রাকৃতিক সম্পদের জোগান ছিল প্রচুর। কিন্তু ক্রমশ জনসংখ্যা বেড়ে চলায় ছবিটা বদলে গেল। এখন মানুষ বেড়েছে। অতি ব্যবহারে ক্রমশই কমে আসছে বা কিছু ক্ষেত্রে এমনকী নিঃশেষিত হয়ে চলেছে নানান প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রকৃতিকে ধ্বংসের বিনিময়ে বাড়ছে মনুষ্যসৃষ্ট মূলধন। বর্তমান কালের এ এক গভীর পরিবেশ সংকট। ম্যালথাস পরিবেশবিদ না হয়েও বহুদিন আগে এমনই আশঙ্কা করেছিলেন। তাঁর আশঙ্কার প্রতিফলন আমরা দেখেছি 'ক্লাব আব রোম' এর বিখ্যাত প্রতিবেদন 'Limits to Growth'-এ। এজন্যই তিনি পরিবেশ ভাবনায় আজও প্রাসঙ্গিক।

উইলিয়ম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

উইলিয়ম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জন্মেছিলেন ১৭৭০ সালে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলতেই আমরা বুঝি এক 'প্রকৃতির কবি'কে, আর আমাদের মনে ফুটে ওঠে ইংলিশ লেক ডিস্ট্রিক্ট অঞ্চলের প্রাকৃতিক নৈসর্গ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কেন 'প্রকৃতির কবি' তা বোঝানোর জন্য তাঁর 'Tintern Abbey' কবিতার দুটি লাইনই যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন — 'Nature never did betray/ The heart that loved her.' তাঁর এই অসামান্য লাইন দুটির মধ্যে অবশ্যই নেই কোন (পরিবেশ) বিজ্ঞান; কিন্তু রয়েছে প্রকৃতি-পরিবেশের ওপর অন্তহীন গভীর এক অনুভূতিপ্রবণ মন, এক পরম অভিজ্ঞতা। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাছে প্রকৃতি দুরকমের — একটি বাইরের প্রকৃতি, অপরটি মানুষের ভেতরের প্রকৃতি। একদিকে তিনি যেমন আদি প্রকৃতি পূজা বা সর্বেশ্বরবাদের স্বরূপ নতুন করে খুঁজতে ব্যস্ত, অন্যদিকে খ্রিস্টান মানবতাবাদ, ব্যক্তি মানুষের প্রজ্ঞা, স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা, শিল্পযুগের শক্তি বিকাশ এবং গ্রামীণ রক্ষণশীলতাও তাঁর চোখ এড়ায়নি।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির একান্ত ছন্দে ব্যক্তিমানুষের সম্পর্ক মেলাতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির প্রতি তাঁর এই রোমান্টিক বা আবেগপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি মূলতই ইকোলজিক্যাল বা বাস্তুতান্ত্রিক। কারণ তাঁর এই প্রকৃতি-মানুষ চেতনার তিনটি প্রধান তত্ত্ব হল উভয়ের সম্পর্ক, পরস্পর নির্ভরতা ও অখণ্ডতা। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এই চেতনা যতটাই বাস্তুতান্ত্রিক, ততটাই মনস্তাত্ত্বিক। কারণ প্রকৃতি-পরিবেশ ভাবনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই হল এক ইকোলজিক্যাল বা বাস্তুতান্ত্রিক মন ও বোধ। আর এখানেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জৈব প্রকৃতির সমগ্রতার সাথে ব্যক্তি মানুষের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের (মানসিক ও দৈহিক সুস্থতা) বিকাশ দেখেছেন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাগুলিতেও আমরা দেখতে পাই যে এক সক্রিয় 'সত্তা'র সঙ্গে 'সজীব' এই প্রকৃতির এক পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক আছে যাকে কবি বলছেন 'ইন্টারচেঞ্জ'। ফিরে তাকানো যাক তাঁর Prelude কবিতার কয়েকটি লাইনে যেখানে তিনি বলছেন —

From Nature doth emotion come, and moods
Of calmness equally are Nature's gift.

....

Hence Genius, born to thrive by interchange
Of pence and excitation, finds in her
His best and purest friend.

এখানে কবি প্রকৃতিকে কেবল কোন জড় বা মৃত পদার্থ বলেননি। প্রকৃতি এখানে জীবন রকম জীবন্ত এক সত্তা।মানুষের সবচেয়ে ভাল এবং বিশুদ্ধ এক বন্ধু। বর্তমান কালের প্রকৃতি বিজ্ঞানীদের কাছেও প্রকৃতির এই সজীব সত্তা এবং মানুষ-প্রকৃতি পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনাই আগ্রহের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু।

হেনরি ডেভিড থোরো

পরিবেশ আন্দোলনের কথা উঠলেই হেনরি ডেভিড থোরো-র নাম নিশ্চিত ভাবেই উঠবে। তার মানে এমন নয় যে থোরো ছাড়া পৃথিবীতে কখনোই কোনও পরিবেশ আন্দোলন হত না। তবে এমন কোনও পরিবেশ আন্দোলন কল্পনা করা কঠিন যেখানে প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য থোরোর প্রেরণাদায়ী ভাবনা অনুপস্থিত। প্রকৃতি-পরিবেশের গভীর মূল্যায়নে থোরোর নানান ভাবনা, যা তাঁর বহু লেখায় ছড়িয়ে রয়েছে, একেবারে কষ্টিপাথরের মতো। কেন না তাঁর নানান লেখা পড়েই প্রাণিত হয়ে আমেরিকার মানুষ পরিবেশ রক্ষার জন্য পথে নেমেছে। থোরো-কে আমেরিকায় বলা হয় 'প্রকৃতি-বিষয়ক রচনার জনক'। তিনি সে দেশের 'পরিবেশ বীর'।

বিখ্যাত সংরক্ষণপন্থী হেনরি ডেভিড থোরো জন্মেছিলেন আমেরিকার বস্টন শহরের প্রায় ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিমের এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে ১৮১৭ সালে। ১৮৩৭ সালে হার্ভার্ড কলেজ থেকে স্নাতক হন। ইচ্ছে করলেই জীবনটা আর পাঁচজন যেভাবে কাটায় কাটাতে পারতেন। কিন্তু কী যে হল! ১৮৪৫ সালের জুলাই মাসের চার তারিখে সব কিছু ছেড়ে জঙ্গলের গাছগাছালির মধ্যে এক জলাশয়ের ধারে থাকতে শুরু করেন। প্রকৃতি ও নির্জনতার নিবিড় ছোঁয়ায় এখানে প্রায় আড়াই বছর কাটালেন থোরো। আবার নিজের গ্রামে ফিরলেন ১৮৪৭ সালের চার সেপ্টেম্বর। জীবনের সামান্যতম চাহিদা নিয়ে, সুকুমার চেতনাগুলিকে জিইয়ে রাখতে সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় এখানে জীবন কাটানোর পরে থোরো বুঝেছিলেন যে 'নির্জনতা কখনোই আমাদের খালি হাতে ফেরায় না'। কিন্তু কেন এই মানুষটি নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে গাছগাছালির মধ্যে এক জলার ধারে জীবন কাটাতে গিয়েছিলেন তা তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক — I went to the woods because I wished to live deliberetely,

to front only the essential facts of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die, discover that I had not lived. I did not wish to live what was not life.' এই লাইনগুলি ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'ওয়ালডেন' (Walden) বইয়ের। থোরো আড়াই বছর যে জলার ধারে জীবন কাটিয়েছিলেন সেটির নাম ওয়ালডেন। নির্জন প্রকৃতি (wilderness) তাঁর ওপর কী গভীর প্রভাব ফেলেছিল তা 'ওয়ালডেন' বইটি পড়লেই বোঝা যায়। থোরো যেন সেখানে প্রকৃতিরই একজন হয়ে গেছিলেন। শোনা যায় যে সেই জঙ্গলের গাছে বাসায় বসে যে মা-পাখি ডিমে তা দিচ্ছে তার বুকের তলা থেকে ডিমটি বার করে নেড়েচেড়ে আবার মায়ের বুকের তলে রেখে দিয়ে গাছ থেকে নেমে আসতেন থোরো। মা-পাখি নাকি এতে একটুকুও ভয় পেত না। প্রকৃতির সঙ্গে এমনই এক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাই তো থোরো বারে বারে তাঁর সকল লেখায় আমাদের মনে করিয়ে দেন যে খোলা বিশাল দিগন্তের মধ্যে যে ঘুরে বেড়াতে পারে তার চেয়ে জগতে কেউ আর সুখী নয়। তাঁর 'ওয়ালডেন'-এ বন্ধন থেকে প্রকৃতির কোলে এমন এক মুক্তির আস্বাদের কথা বলেছেন যেখানে জীবন হতাশা বা বিষাদে নয়, আনন্দ ও জ্ঞানে ভরে উঠবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও থোরো আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে প্রকৃতিকে দূরে সরিয়ে রেখে এই আনন্দ বা জ্ঞান কোনটাই সম্ভব নয়।

থোরো তাঁর শেষ দিকের লেখায় যে পরিবেশ আন্দোলনের কথা বলেছেন সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং তার নিয়ন্ত্রিত ও মজবুত ব্যবহারের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি সব সময় চাইতেন মানুষ যেন নিজের অঞ্চলের মাটি, নদী, গাছপালা, পশুপাখির সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাটায়। তাঁর কাছে পরিবেশ আন্দোলন মানে এটিই ছিল, কোনওরকম তত্ত্বে তাঁর মন ছিল না। তিনি বার বার বলেছেন প্রকৃতি আমাদের হাতে কোন প্লাস্টিক বস্তু নয় যে যেমন খুশি

আমরা তাকে ব্যবহার করব বা গড়ে তুলব। আমাদের যদি এমন ভয়ংকর ইচ্ছা জাগে তাহলে প্রাকৃতিক শক্তির একে এড়িয়ে যাবার এমনকী ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। তিনি বরাবরই মানব প্রকৃতির সাথে বাইরের প্রকৃতির মিলন চেয়েছেন। আর কে না জানে বর্তমান কালের নানান পরিবেশ সংকটের হাত থেকে নিস্তার পাওয়ার এটিই অন্যতম পথ।

কার্ল মার্কস্

দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ এবং আধুনিক সাম্যবাদ এর প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস্-এর জন্ম ১৮১৮ সালে। নানান আর্থ-সামাজিক কারণে বিশেষ করে শিল্প বিপ্লবের পরে মানুষের চেতনা ও জীবন যে ভীষণ রকম সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তা নিয়ে মার্কস্ গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। শ্রমিক শ্রেণির ওপর পুঁজিবাদীদের শোষণের ফলে যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ ঘটছিল, মার্কস্ দেখেছিলেন, তাতে সমস্ত রকম মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক, এমনকী প্রকৃতির সঙ্গেও, টাকার অংকে বাজারি দামে নির্ধারিত হচ্ছিল। মার্কস্ এই অবস্থাকে বললেন 'বিচ্ছিন্নতা' (alienation)। প্রকৃতির সাথে মানুষের, মানুষের নিজের জীবনীশক্তির সাথে নিজের এবং মানুষের সাথে মানুষের এক বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃতির সাথে মানুষের এই বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া দিতে পারে একমাত্র সাম্যবাদ।

মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক নিয়ে মার্কসের যে নৈতিক অবস্থান তার দুরকম মানে হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতির ওপর মানুষের শোষণের সরাসরি সমালোচনা করেছেন। 'On the Jewish Question'(১৮৪৪) প্রবন্ধে তিনি যা লিখলেন তাঁর মূল কথা হল প্রকৃতিতে ব্যক্তিগত সম্পদের মতো দেখা হয়; প্রকৃতির এই অবস্থা ও তার অবনতির জন্য পুরোপুরি দায়ী হল টাকা বা অর্থ

('The view of nature attained under the domination of private property and money is a real contempt for, and practical debasement of nature..... .')। আবার ওই একই প্রবন্ধে টমাস মুনজার -কে উদ্ধৃত করে লিখলেন যে জলের মাছ, আকাশের পাখি, পৃথিবীর গাছপালাকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। সমস্ত প্রাণী মুক্ত বা স্বাধীন থাকবে ('It is intolerable that all creatures have been turned into property; the fishes in the water, the birds in the air, the plants on the earth; the creatures, too, must became free')। মার্কস্ জোর দিয়ে বললেন যে আমরা এই গ্রহটির মালিক নই। উত্তরাধিকার সূত্রে এর সম্পদ দেখভাল ও কিছু ক্ষেত্রে ভোগ করার অধিকার পেয়েছি মাত্র। এ কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে এই পৃথিবীকে আরও উন্নত অবস্থায় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে আমাদের দিয়ে যেতে হবে। ব্রান্টল্যাণ্ড কমিশনের প্রতিবেদনেও এই একই কথা বলা হয়েছে। আর মার্কস্ যখন এ কথা বলেন তখন আমাদের বুঝে নিতে একটুও অসুবিধা হয় না প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য আমাদের এক দায়বদ্ধতার কথাই তিনি বলছেন। কখনো তিনি এমন কথাও বলেছেন যা আধুনিক পরিবেশবাদীদের বক্তব্যের সঙ্গে কী দারুণ মিলে যায় —

> 'Man lives from nature — i.e., nature is his body - and he must maintain a continuing dialogue with it if he is not to die. To say that man's physical and mental life is linked to nature simply means that nature is linked to itself, for man is a part of nature'. (Economic and Philosophical Manuscripts, first manuscript.)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১ সালের ৬ মে কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। শিশুবেলা থেকেই চারপাশের প্রকৃতি তাঁর মনকে টানত। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে এক নান্দনিক দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। আর সে জন্যই চেয়েছিলেন যে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে 'রঙে-রেখায়, সজীবতা ও চলমানতায় যে বিশেষ সুরটি' ('...special harmony of lines, colours and life and movement') রয়েছে তাকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। 'The Religion of Man' রচনায় তিনি আমাদের এ কথা বলেছেন।

একে রক্ষা করার কারণ হিশেবে রবীন্দ্রনাথ বলছেন প্রকৃতির মনোমুগ্ধকর রূপ আমাদের নান্দনিক বোধকে জাগিয়ে তোলে। এই নান্দনিক বোধ থেকে মনে জাগে এক পরম আনন্দ যা একেবারেই স্বার্থশূন্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'Lectures and Addresses' রচনায় একে বর্ণনা করেছেন — 'the enjoyment which is disinterested'। 'The Religion of Man' রচনায় তিনি আরও বলেছেন যে মানুষ তাকেই প্রকৃতি বলে যা তার কাছে প্রকৃতি রূপে ফুটে ওঠে। এটিই সত্য যে আমরা এর দ্বারা প্রভাবিত হই এবং প্রকৃতিকে নানাভাবে প্রকাশ করি ('What we call nature is what is revealed to man as nature. ...... Reality is ......[that] by which we are affected, that which we express.')

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাঝবয়সে প্রায় চল্লিশ বছরে পৌঁছে স্থির করেছিলেন শিক্ষাব্রতী হবেন। ১৯০১ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় চালু করেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা মানে নিছক জ্ঞানলাভ নয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ ও মনের মুক্তির এক আকাঙ্ক্ষিত পথ এটি। ছোটবেলায় রবীন্দ্রনাথ যে শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে

বড় হয়েছিলেন তা তাঁর মোটেও ভাল লাগেনি। সেখানে প্রকৃতি ছিল নির্বাসিত। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের একেবারে গোড়ায় ছিল মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক। এজন্যই শিক্ষার ক্ষেত্র হিশেবে তিনি এমন একটি জায়গা বেছেছিলেন যেখানে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতির সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ থাকতে পারবে। শিশু শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যাকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সহজপাঠ' লিখেছিলেন তাদের জীবনের প্রয়োজন মেনে। সহজপাঠের প্রধান বিষয় শিশুদের চারপাশের স্বাভাবিক পরিবেশ — গাছপালা, ফল-ফুল, নানান প্রাণী, নদী, গ্রাম ইত্যাদি। এসবের মধ্য দিয়ে তিনি শিশুমনকে ধরতে চেয়েছেন। চেয়েছেন চারপাশের পরিবেশ থেকে শিশু তার শিক্ষা নিক। তার কল্পনার ডানা মেলুক।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে মানুষ এই প্রকৃতিকে দুভাবে দেখতে পারে। একটি হল একে কাজের বিষয় হিশেবে ভাবা। অন্যটি হল একে আনন্দের বিষয় হিশেবে ভাবা — অর্থাৎ কোনরকম কাজের বিষয় বা পার্থিব উদ্দেশ্যসাধনের বিষয় হিশেবে না ভাবা। শিশু যেমন থেকে থেকে অকারণে খুশি হয়ে ওঠে, হাসতে থাকে, নাচতে থাকে, মানুষেরও তেমন প্রকৃতি সম্পর্কে এক অকারণ আনন্দবোধ আছে। প্রকৃতির বাইরের রূপ থেকে মানুষ তার এই আনন্দের সূত্রটি খুঁজে নেয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — 'এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর/ এত সুখ আছে, এত সাধ আছে — প্রাণ হয়ে আছে ভোর।' (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ) রবীন্দ্রনাথ তাঁর সবুজ শিক্ষায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কাজের কথাটা কিন্তু একেবারে বাদ দিতে চাননি। তবে অকাজের বিষয়টি অর্থাৎ আনন্দের দিকটিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আর এটিই তাঁর সবুজ শিক্ষা দর্শনের অন্যতম প্রধান বুনিয়াদ। তাই দেখা যায় জীবনের শেষ বেলায় এসেও তিনি বলছেন —

> 'আমি যে বেঁচে আছি, তা কেবল এই পৃথিবীকে ভালবেসেছি বলে। এত ভালবেসেছি যে বলতে পারিনে। প্রকৃতির আলো বাতাস গাছ সব যে কী ভালবেসেছি; কী অপরিসীম আনন্দ পাই, তা কতটুকু প্রকাশ করতে পারি। প্রকৃতি আমার চোখে সে কী রূপ তার মেলে ধরে – তাতে আমি ডুবে যাই।' (আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ, শ্রী রানি চন্দ)

প্রকৃতির মানুষের প্রয়োজন মেটানোর দিকটা রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন এক অন্য দৃষ্টি দিয়ে। তিনি বুঝেছিলেন যে অসহায় গরিব মানুষদের এমন শিক্ষা দেওয়া দরকার যাতে প্রকৃতির দানে তাদের অভাব মেটানোর সুযোগটি আরও বাড়ানো যায়। তাই রবীন্দ্রনাথ গরিব গ্রামবাসীর অভাব দূর করার কাজে বিজ্ঞানকে যথাযথ ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলেন। একদিকে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় গড়ে তোলার মধ্যে যেমন শিশু ও প্রকৃতির মধ্যেকার আনন্দের দিকটি চোখে পড়ে, তেমনই শ্রীনিকেতন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সহায়তায় প্রকৃতির দানে গরিব গ্রামবাসীর প্রয়োজন মেটানোর দিকটি স্পষ্ট ধরা দেয়। শ্রীনিকেতনের মাটির চরিত্র কেমন, কোন্ মাটিতে কী সার দিতে হবে, কেমন করেই বা ফলন আরও বাড়ানো যাবে — এ সমস্ত কাজেই তিনি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম মেনে বিজ্ঞানকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে চেষ্টা করেছিলেন।

উপনিষদের শিক্ষা রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবন ধরেই প্রকৃতি-মানুষ সম্পর্ক খুঁজে ফিরেছেন। চেয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির মিলন তাঁর নানান কাজের মধ্য দিয়ে। তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষ যখন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে শেখে, তার মানসিক পরিধি আরও বিস্তৃত হয়। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ যখন তার নিছক প্রয়োজনের সম্পর্কটির গণ্ডি পেরোতে পারে তখনই প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক পূর্ণতা পায়। অর্থাৎ প্রকৃতিতে আমরা যখন খুব কাছের মানুষের মতো ভালবাসতে পারি তখন

তাকে আর কখনোই শুধু প্রয়োজন মেটাবার বস্তু হিশেবে ভাবতে পারি না। বলেছিলেন --

> 'মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্বন্ধ দুরকমের। একটি প্রয়োজনের, অপরটি প্রেমের। প্রকৃতির সম্পদ গ্রহণ করে মানুষ জীবনধারণ করে। এক্ষেত্রে মনুষ্যেতর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের ভেদ নাই। এখানে সে প্রকৃতিকে উপকরণমাত্র রূপে দেখে। কিন্তু যখনই প্রেমের সম্বন্ধ আরম্ভ হয়, প্রকৃতি উপকরণ রূপ ত্যাগ করে সজীব সত্তা হইয়া ওঠে। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রকৃতির কাজ মানুষের প্রাণের মহলে, প্রেমের ক্ষেত্রে তার কাজ মানুষের চিত্তে। প্রকৃতির মধ্যে যখনই কেবল আছি মাত্র, তখন না থাকবারই সামিল, কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণমনের সম্বন্ধ অনুভবের মধ্য দিয়েই আমরা নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করি। মানুষের নিজের জন্যই, নিজের আত্মোপলব্ধির জন্যই প্রকৃতির সঙ্গে মিলন আবশ্যক। আত্মোপলব্ধি মানে নিজের সীমানাকে খুঁজে পাওয়া।'

তখন প্রকৃতির মধ্যেই নিজের অস্তিত্ব টের পায় মানুষ। অনুভব করে এক পরম মুক্তি। 'The Religion of an Artist' রচনায় বিশ্বকবি এই মুক্তির আনন্দের খোঁজটি আমাদের এভাবে দিয়েছেন -----

> 'I still remember the very moment, one afternoon, when I ....suddenly saw in the sky ......an exuberance of deep, dark clouds lavishing rich, cool shadows on the atmosphere. The marvel of it ..... gave me a joy which was freedom, the freedom we feel in the love of our friend.'

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি গুজরাতের পোরবন্দরে ১৮৬৯ সালে ২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা আজও সারা পৃথিবীতে এক আলোচনার বিষয়। গান্ধির সামাজিক এবং পরিবেশ দর্শনের মূল ভিতটাই দাঁড়িয়ে আছে বাঁচতে গেলে মানুষের কী প্রয়োজন তার ওপর। মানুষ কী চায় সেটা প্রধান বিবেচনার বিষয় নয়। অবহেলিত, গরিব, গ্রামের মানুষের বাঁচার জন্য স্থানীয় সামাজিক এক বিকল্প পথ খোঁজার চেষ্টাই গান্ধির দর্শনের মূল কথা। গান্ধি বুঝেছিলেন যে ভারতে শিল্পায়নের বিকাশের ফলে মানুষের মধ্যে ভোগবাদী নানা চাহিদা বাড়ছে। আর এই চাহিদার জোগান দিতে অচিরেই শেষ হবে আমাদের সীমায়িত প্রাকৃতিক সম্পদ। এ ব্যাপারে আমাদের মনে রাখতে হবে গান্ধির চেতাবনি 'প্রকৃতি আমাদের প্রয়োজন মেটাতে দিয়েছে প্রচুর কিন্তু লোভ মেটাতে নয়'। গান্ধিজি লক্ষ করেছিলেন পশ্চিম দেশের প্রযুক্তি-নির্ভর, মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করা পরিবেশ-ধ্বংসকারী শিল্পায়ন আমাদের পরিবেশ-বান্ধব, দেশিয় গোষ্ঠী-নির্ভর বেঁচে থাকার ব্যবস্থাকে ক্রমশ শেষ করে দিচ্ছে। তাই তিনি আমাদের সাবধান করে বললেন ---

> 'God forbid that India should ever take it to industrialization in the manner of the west. The economic imperialism of a tiny island kingdom is today keeping the whole world in chain. If an entire nation of 300 million took to similar economic exploitation it would strip the world bare like locust.'

আজ পৃথিবীর দিকে তাকালে বোঝা যায় গান্ধিজির এই ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।

গান্ধিজি তাঁর সবরমতী আশ্রমে দেশিয় সনাতনী প্রথায় চাষবাস, জলসেচ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন ইত্যাদি চালু করেছিলেন। বাণিজ্যিক প্রথায় রাসায়নিক সার-কীটনাশক দিয়ে পরিবেশ ধ্বংসকারী চাষের বদলে তিনি নানা প্রকার শাকসবজি ও ফলের চাষের ওপর জোর দিতেন। পশুদের ওপরেও তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। গান্ধিজি তাঁর আশ্রমে চরকায় সুতো কেটে যে খাদি কাপড় তৈরি করতেন তার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল যন্ত্র-সভ্যতার ধোঁয়া-ধুলো ধূসরিত দূষণ এড়ানো। তিনি মানুষকে সবসময় সহজ-সরল, অনাড়ম্বর ও অহিংস জীবন কাটাতে বলেছেন। আজকের ভোগবাদী দুনিয়ায় প্রকৃতি-পরিবেশকে নির্মল রাখতে যার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

দুর্নীতির পরিবেশ, পরিবেশে দুর্নীতি

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

১৯৭০-এর দশকের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ গুনার মাইড্রাল 'এশিয়ান ড্রামা' নামে একটি বই লিখেছিলেন যে বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য ছিল এশিয়ার বুকে বিভিন্ন দেশে পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হবার একটি অন্যতম কারণ দুর্নীতি। বইটির প্রতিপাদ্য নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছিল এবং অনেকেই এই উপস্থাপনাকে বাস্তব বলে মেনে নিতে পারেননি। তারপর অনেকটা বছর কেটে গেছে। ভারতবর্ষের মাটিতে বহু ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনার শেষেই দেখা গেছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়নি। কারণ দুর্নীতি। রাজ্য সভা থেকে লোকসভা সর্বত্রই দুর্বৃত্তায়নের প্রতিযোগিতা।

একবিংশ শতাব্দী পরিবেশ সঙ্কটের শতাব্দী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ সঙ্কটের সমাধান সূত্র খোঁজার চেষ্টা চলছে। তবে এই প্রচেষ্টার আন্তরিকতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। ভারতবর্ষের বুকে পরিবেশ সঙ্কটকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে একাধিক আইন তৈরি হয়েছে। জল দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষের কার্যকলাপকে দূষণমুক্ত রাখতে আইনের কোন ঘাটতি নেই কিন্তু চোখ ফেরালে দেখা যায় সমস্ত পরিবেশ আইনকেই দুর্নীতি নামক ভাইরাসটি গ্রাস করেছে।

- সাম্প্রতিক কালে বেআইনি খনি খননের জন্য কর্ণাটক সহ বিভিন্ন রাজ্যে দুর্নীতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অবৈধ খননকার্য পরিবেশ ধ্বংসের একটি অন্যতম কারণ। ১৯৮৬ সালে পরিবেশ সুরক্ষা আইন অনুযায়ী কোনরকম খনি সংক্রান্ত খননকার্য করতে গেলে সুনির্দিষ্ট পরিবেশ ছাড়পত্র প্রয়োজন। মহামান্য ভারতের উচ্চ আদালত সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণা করেছেন যে পরিবেশ সমীক্ষা

ছাড়া কোন খননকার্য করা যাবে না। বিচার ব্যবস্থা বা দেশের আইনকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রয়েছে বেআইনি খনি, আইনি খনির থেকে অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গে বেআইনি কয়লার খনি নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। বীরভূমের পাথর খাদান সেই একই পথের পথিক। সব কিছুকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে খননকার্য চলছে, দুর্নীতির কালো মেঘ সমস্ত সৎ প্রচেষ্টাকে প্রায় গ্রাস করেছে।

• সমুদ্র সৈকত নিয়ন্ত্রক আইন ভঙ্গ করে বম্বের বুকে 'আদর্শ' নামক গৃহনির্মাণের কথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এমনকী 'আদর্শ' নামক বাড়ি নির্মাণ কাজ ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা দপ্তরের নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করেছে। কিছুদিন ধরে কাগজে লেখালেখির পর সব ব্যাপারটাই থমকে দাঁড়িয়েছে। 'আদর্শ' আবাসনটি একদিনে তৈরি হয়নি, ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে এবং সমুদ্র সৈকত নিয়ন্ত্রক আইনকে সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করে। ১৯৯১ সালে সমুদ্র সৈকতের জীববৈচিত্র্য ও তার নান্দনিক সৌন্দর্য ও বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষার জন্য আইন হলেও ভারতবর্ষের সমুদ্র সৈকত জুড়ে আইন লঙ্ঘন করার ইতিহাস প্রলম্বিত হয়েছে। কারণ একটাই, দুর্নীতি পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র সৈকতও সেই একই নিয়ম ভাঙার খেলার সফরসঙ্গী হয়েছে। মন্দারমনি থেকে দিঘা, তাজপুর সহ সুন্দরবন কোনো জায়গাতেই আইন মানা হয়নি। মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট বারবার ঘোষণা করেছেন সমুদ্র সৈকতের বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। নীতিহীনতা উদ্দাম গতিতে এগিয়ে চলেছে। কোনো আইন বা প্রশাসন বা বিচার ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

• জলাভূমি সংরক্ষণ বা নদীর দিকে ফিরে তাকানোর কথা বহুবার আলোচিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য আইন হয়েছে এবং সাম্প্রতিক কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত

জলাভূমিগুলিকে রক্ষা করার জন্য আইন তৈরি হয়েছে। গঙ্গা-যমুনা সহ নদীকে দূষণ থেকে মুক্তি দেবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে জলাভূমি ভরানোটাই আজকের দিনে সব থেকে বড় সংকট। কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় জলাভূমিগুলি সবার সামনে ভরাট হচ্ছে, কিন্তু প্রশাসন থেকেও নেই। কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রতিবাদ করলেও অদ্ভুত কৌশলে প্রশাসন জানিয়ে দেয় সরকারি খাতায় যেহেতু জলাভূমির অস্তিত্ব নেই সেহেতু তারা অপারগ। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি সহ হাওড়া, হুগলি, চব্বিশ-পরগনা এলাকাতে জলাভূমি ভরাট প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। যদি কেউ বেশি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। এ তো গেল জলাভূমির কথা। এমনকী নদী পর্যন্ত হারিয়ে যায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে। উত্তর চব্বিশ-পরগনাতে সোনাই নামে নদী ছিল তা আজকে সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে। সরস্বতী নদীর একই অবস্থা। সরস্বতী নদী বা সোনাই নদী রক্ষা করার কথা জনস্বার্থ মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার বিভাগ আদেশ দিলেও তা কখনোই বাস্তবে কার্যকরী হয় না। জলাভূমি, নদী সংরক্ষণের জন্য আইনের অভাব নেই, কিন্তু সমস্ত আইনকে পাশ কাটিয়ে অধুনা 'প্রমোটার' নামক কিছু ব্যক্তি সবই বুজিয়ে ফেলছেন আর প্রকৃতির চরম সর্বনাশের ইতিবৃত্ত তৈরি হচ্ছে। প্রশাসন নির্বিকার। প্রশাসন সহ সমাজের সমস্ত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি প্রায় এক অদ্ভুত স্থবিরতায় আক্রান্ত। এখন পর্যন্ত শোনা যায়নি এমন কোন ব্যক্তি বা সংগঠন একটা হ্যান্ডবিল দিয়ে বলছেন যে, জলাভূমি বুজিয়ে নির্মীয়মান বাড়ি আমরা কেউ কিনব না, কারণ আজকের দিনে প্রকৃতির ধ্বংসে আগামীদিনের সভ্যতা ধ্বংসের কারণ।

• কোচবিহারের বুকে করোলা বলে একটি নদী আছে। পাহাড়ি নদী মিষ্টি ছন্দে বয়ে চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে। সেই 'করোলা' নদীর বুকে দেখা গেল পড়ে থাকা চিকিৎসা বর্জ্য। নদীর জল হল বিষাক্ত। ভারতবর্ষের বুকে চিকিৎসা বর্জ্য সঠিকভাবে দূষণমুক্ত করার জন্য ১৯৯৮ সালে আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার বাঞ্ছাখাটি থেকে আরম্ভ করে সর্বত্রই যত্রতত্র সিরিঞ্জ বা

অন্যান্য চিকিৎসাজাত বর্জ্য পাওয়া যায় এবং সেইগুলি আবার নতুন মোড়কে ফিরে আসে বিভিন্ন হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে। চিকিৎসা বর্জ্য নিয়ে দুষ্ট চক্রের কাজকর্ম চলে প্রায় খোলাখুলি ভাবে। মাঝেমাঝে ধরা পড়ে, পুলিশ বা প্রশাসন ঝুপড়িবাসীদের নিয়ে টানাপোড়েন করে, তারপর সবই হারিয়ে যায় এক সংগঠিত দুষ্ট চক্রের কাছে।

ভারতবর্ষ জুড়ে বিস্তৃত পরিবেশ ধ্বংসের মধ্যে এই কয়েকটি ঘটনা কেবল কয়েকটি খণ্ডচিত্র। দূষণ সৃষ্টি করে মূলত সমাজের ওপর তলার মানুষ যারা প্রায় আমাদের মতো দেশের অর্থনীতিকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী পরিবেশ আইন সৃষ্টি হলেও দূষণসৃষ্টিকারী জানে ভারতবর্ষে দুর্নীতি গভীরভাবে প্রোথিত। আইনকে অগ্রাহ্য করে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থায় তারা স্বচ্ছন্দে দূষণ ঘটাতে পারে এবং তাদের কোনও শাস্তি হয় না। যদিও বা কমবেশি নড়াচাড়া বা লেখালেখি হয় কিছুদিন পরে তা আবার অদ্ভুত আঁধারে হারিয়ে যায়। দুর্নীতির আঁধারে হারিয়ে যাওয়া পরিবেশ সংকট আরও ঘনীভূত হয়।

এত কিছুর মধ্যেও কোনোভাবেই দুর্নীতির ইতিহাসই শেষ কথা বলবে এ কথা মেনে নেওয়া যায় না। কারণ পশ্চিমবঙ্গের বুকে কয়েক বছরের মধ্যে পরিবেশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কমপক্ষে ছয়জন শহিদ হয়েছেন। পরিবেশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষ ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করে বলতে হয় :

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

প্রসঙ্গ : পরিবেশ ভাবনা

বেবী বসু (গুপ্ত)

পরিবেশ চেতনা অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের ভাবনার মধ্যে ছিল, তবে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে বিজ্ঞানী এ জি ট্যান্সলি, ই পি ওডাম, লিন্ডেম্যান প্রমুখ পরিবেশতত্ত্ব, বাস্তুতন্ত্র, খাদ্যশৃঙ্খল প্রকৃতির প্রতি বিশেষ আলোকপাত করে বিজ্ঞানের একটি নতুন শাখার সৃষ্টি করেন। বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তো অতি সহজেই পরিবেশের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, যার মতো সোজা সংজ্ঞা পাওয়া দুর্লভ। বলেছিলেন, 'আমি ছাড়া সবই আমার পরিবেশ ('....environment is everything that isn't me...... ')। প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিয়ে সুপ্রাচীনকাল না হলেও বহু বছর ধরেই মানুষ ভাবনা চিন্তা করে আসছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরিবেশ বিষয়ে গভীরভাবে ভেবেছিলেন। বোলপুরের ক্ষয়ে যাওয়া ভূ-আস্তরণ (খোওয়াই) আজ তাই সবুজে সবুজে মাখামাখি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি একবার আমার পরিচিত এক বিদেশিনীকে এই খোওয়াই-এর উপর রবীন্দ্রনাথের স্কেচ চিত্রের কথা বলায় তৎক্ষণাৎ সে ইন্টারনেটে বোলপুরের ভূ-প্রকৃতির রূপ দেখে আমায় জানায় 'কোথায় খোওয়াই? শুধুই তো সবুজ সুন্দর গাছপালা।' সে খোওয়াই-এর রূপ দেখতে না পেলেও খুশি হয়েছিল যে কীভাবে মানুষের সচেতনতায় শুকনো মাটি এমন দৃষ্টিশোভন ও মানব কল্যাণকর হয়ে উঠতে পারে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে বিশ্বজুড়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীরা কী অর্থনীতি, কী সমাজনীতির ওপর নজর রাখছেন। নোবেল জয়ী অমর্ত্য সেনের গবেষণা

মূলক লেখায় উৎপাদন-ব্যয় এর সঙ্গে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে সামাজিক ব্যয়। কারখানার কালো ধোঁয়া বা বর্জ্য পদার্থ জলাশয়-নদী প্রভৃতিতে মিশে সেই অঞ্চলের মানুষের ক্ষতি যে কতটা হয় তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পোদ্যোগীদের উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ধরা থাকে না। এই সামাজিক ব্যয় যে কতখানি হতে পারে তা অনুধাবন করতে ভূপাল গ্যাস-চেরনোবিল-ফুকুশিমার দুর্ঘটনাগুলি স্মরণযোগ্য। তাই আজ পরিবেশ বিজ্ঞানী তথা সকল শাখার বিজ্ঞানীরা, অর্থনীতিবিদ, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক এমনকী নৃতত্ত্ববিদরাও নানা ভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণারত।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ -এই দুই এরই ওপর গুরুত্ব দাবি করা হয়েছে বারে বারে। রবীন্দ্রনাথ যেমন 'পঞ্চভূত' - এর মতো মননশীল রচনায় ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ, তেজ ও ব্যোম - এর ওপর ব্যক্তিসত্তা আরোপ করে তাদের গুরত্ব ও কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করেছেন মনোজ্ঞ ভাষায়, তেমনই মানুষের জীবনে শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ থেকে শুরু করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু নানা ভাবে তাঁদের জীবন চর্যার মধ্য দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে থেকে শিক্ষা গ্রহণের কথা মনে করতে গেলে নির্লোভ, নিষ্কাম 'বুনো রামনাথ' পণ্ডিতের কথা ভুলে গেলে চলে না। তেঁতুলতলায় তাঁর পাঠশালা, তেঁতুলপাতা সেদ্ধই গুরু ও বিদ্যার্থীদের প্রয়োজনীয় আহার —তারই মাঝে সুশিক্ষার বিস্তার ঘটত। ছাতিমতলায় খোলা আকাশের নিচে শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর শৈশবের গণ্ডিবদ্ধ শ্রেণিকক্ষ থেকে শিক্ষাকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে শিক্ষা হল মনের মুক্তি, ভাবনার বিকাশ, সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রধান সড়ক ------ 'এই

আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়' কিংবা 'শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল'। ইংরাজ কবি জন মেসফিল্ড ওই west wind কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন '...balm for bruised heart.......sleep for aching eyes.....'।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ভাবনাকে বিদ্যাসাগর কতটা গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা সর্বজন বিদিত। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যা-শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে একটি রূপকের মাধ্যমে বলেছিলেন —বিদ্যা হল কমল হিরের ভার, সংস্কৃতি হল তার দ্যুতি। অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিদ্যার্জনের চাইতেও প্রকৃত শিক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা মানব কল্যাণকর। বিদ্যার্জনের জন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বিশ্বপৃথিবীই তার উৎস হতে পারে কিন্তু সংস্কৃতি হবে দেশজ — উপমা দ্বারা বলেছিলেন আলোবাতাসের জন্য একটি বৃক্ষ ডালপালা বিস্তার করে চতুর্দিকে, কিন্তু তার শিকড় থাকে নিজস্ব মাটিতে প্রোথিত। কিশোর কবি সুকান্ত অঙ্গীকার করেছিলেন নব প্রজন্মের জন্য 'এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য' করে তোলার — সার্বিক ভাবে পরিবেশ দূষণমুক্ত করাই যার মূল কথা।

প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি তাই সাংস্কৃতিক পরিবেশ সুরক্ষিত করা অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু এ বিষয়ে দূষণ চিহ্নিত করা অতীব জটিল কারণ কোনও যন্ত্র দিয়ে তা পরিমাপ যোগ্য নয়। তবে 'প্রকৃতশিক্ষা'-ই এই পরিবেশ তৈরিতে সক্ষম। পরিবেশ মেলার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

এই পরিবেশ ভাবনায় বিশ্বব্যাপী কত না ব্যক্তিত্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে ভেবেছেন তার সীমা-পরিসীমা নেই। কয়েক বছর আগে ইংল্যান্ডের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন উপাচার্য লর্ড অ্যাটেনবরো,

যিনি 'গান্ধি' চলচ্চিত্র পরিচালক রূপে সুপরিচিত, তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে একটি ছোট্ট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন যে, একবার আফ্রিকার এক ছোট্ট শহরের পথে ধূলিমলিন এক মহিলাকে দেখেছিলেন পানীয়ের ফেলে দেওয়া টিনের ক্যানগুলিকে জড়ো করে বিক্রি করছেন রোজগারের উদ্দেশ্যে। অ্যাটেনবরো নিজের গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সেই মুহূর্তে তাঁকে যদি কেউ কিছু দিতে চান, তাহলে সেই মহিলা কী চাইবেন। উত্তরে সেই হতদরিদ্র মাতা বলেছিলেন, 'আমার সন্তানদের জন্য শিক্ষা'।

পৃথিবীর সর্বত্র তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি প্রকৃত অর্থে শিক্ষা, আদর্শ, ন্যায়বোধ প্রভৃতি পাঠাভ্যাসের অন্তর্গত করতে না পারলে মানব সভ্যতার পথ সুগম হবে না। কী ধর্মীয় গোঁড়ামী, কী কুসংস্কার, সন্ত্রাসবাদ, ক্ষমতার অপব্যবহার, মানুষে মানুষে হানাহানি সবই আগাছার ন্যায় সমাজ পরিমণ্ডলকে দূষিত করে তুলবে। তাই সার্বিক দূষণমুক্তি হওয়া দরকার।

নদী তুমি কার

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

• ১৯৪৭ সালের বিখণ্ডিত স্বাধীনতা কেবল মানুষকে ভাগ করেনি, প্রাকৃতিক সম্পদেও ভাঙনের সাতকাহন সূচিত করে দেয়। সিন্ধুনদী ও তার শাখানদীর জলবণ্টন নিয়ে আজও পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মন কষাকষি অব্যাহত। কবে কীভাবে এই সমস্যা মিটবে তা কেউ জানে না।

• পূর্ব পাকিস্তান বা অধুনা বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের নদীগুলির জলবণ্টন নীতি আজও অমিমাংসীত। এই দুটি দেশের মধ্যে অসংখ্য নদী, উপনদী, শাখানদী রয়েছে যারা ক্রমাগত দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিষ্টি জলের চাহিদা পূরণ করে। পৃথিবীতে সম্ভবত এমন দুটি দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না যাদের মধ্য দিয়ে এইভাবে নদীর মালা রচিত হয়েছে।

• ভারতবর্ষের নিজস্ব ভূমিতে আন্তঃরাজ্য জলবণ্টন সমস্যা বিদিত। কাবেরী জলবণ্টন নিয়ে উচ্চবিচারালয় থেকে অসংখ্য কমিশন এই সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু দক্ষিণের রাজনীতি আজও কৃষ্ণা, কাবেরীর জলবণ্টন সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

• উত্তরভারতে গঙ্গা-যমুনার জলবণ্টন নীতি প্রায় এক চিরকালীন সমস্যার মুখোমুখি। বহু পরিকল্পনা হয়েছে, কমিশন হয়েছে, কিন্তু আজও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঠান্ডা যুদ্ধ অব্যাহত।

• নর্মদার জলের ভাগাভাগি নিয়েও অনেক রাজনৈতিক টানাপোড়েন হয়েছে। পারস্পরিক রাজ্যগুলোর মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া নর্মদা আজও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি।

আন্তর্জাতিক স্তরে, জাতীয় স্তরে বা আঞ্চলিক স্তরে নদীর জল নিয়ে দ্বন্দ্বের শেষ নেই কারণ নদীর জলই ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ, আর এই সম্পদের উপরেই নির্ভর করে রয়েছে মানুষের জীবন-জীবিকা। কৃষিকাজ ও পানীয় জলের প্রয়োজন মেটাতে দেশের সঙ্গে দেশের, রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের দ্বন্দ্ব। কিন্তু যে নদীগুলির জলবন্টন নিয়ে এত সমস্যা সেই নদীগুলির স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। কেবল কয়েকটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও আপতকালীন চাহিদার স্বপ্ন পূরণ করতেই নদীকে টুকরো করার ইতিহাস রচিত হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীকে পরিবেশের শতাব্দী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং পরিবেশগত সমস্যার অন্যতম উপাদান হল মিষ্টি জলের চাহিদা পূরণ। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্বীকার করে নিয়েছেন এই মুহূর্তেই তৃতীয় বিশ্বে দুশো কোটি মানুষ জলের অভাবে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত। অনেক পরিবেশবিদ মনে করেন আগামীদিনে মিষ্টি জলের অধিকার রক্ষাই হয়তো রাষ্ট্রীয় সংঘাতের কারণ হতে পারে এমনকী তা সর্বশেষে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। এত কিছুর মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি বিষয়বস্তু সম্ভবত আলোচনার পাদপ্রদীপে কিছুতেই আসছে না, সেটি হল নদীগুলির স্বাস্থ্য সমীক্ষা। আমরা ক্রমাগত নদীগুলিকে টুকরো করছি, কিন্তু যে কারণে টুকরো করছি অর্থাৎ জল পাবার জন্য কিন্তু সেই নদীতে আদৌ জল আছে কিনা কেউ জানে না। কাগজে কলমে হাজার হাজার কিউসেক জলবন্টনের নীতি ঘোষিত হচ্ছে কিন্তু সেই নদীতে সেই পরিমাপ সংক্রান্ত কারুর কোন বক্তব্য নেই। ইদানিংকালে কোন শিল্প বা নদীর উপর কোন বন্দর বা এমনকী জেটি বা বালি তুলতে গেলেও পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয় এবং এই ছাড়পত্র পাবার জন্য পরিবেশগত সমীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। পৃথিবী জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের অসাবধানতা বশত প্রতিকূল পরিবেশ তৈরি করার প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চেষ্টা অব্যাহত। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পৃথিবী জুড়ে আন্তর্জাতিক ও

জাতীয় স্তরে আলোচনার সীমা নেই। কিন্তু নদীগুলিকে যখন ইচ্ছেমতন টুকরো করা হচ্ছে তখন আর আলোচনার বা পরিবেশ সমীক্ষার কোন প্রয়োজন থাকছে না। বিশ্ব জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় নদীগুলির নাভিশ্বাস উঠেছে। পৃথিবীতে যে দশটি নদী অত্যন্ত গুরুতরভাবে আক্রান্ত এবং আগামীদিনে যারা অস্তিত্বের সংকটের মুখোমুখি, এইরকম দশটি নদীর মধ্যে দুটি নদী ভারতবর্ষে যথাক্রমে গঙ্গা এবং সিন্ধু। এই নির্মম সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আমরা ক্রমাগত নদীকে টুকরো করছি, কোনরকম স্থিতিশীল বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা ছাড়াই। রবীন্দ্রনাথ থেকে বিবেকানন্দ সহ বহু প্রাজ্ঞজনই গঙ্গার দুরবস্থা নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ভারতবর্ষের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা বহুদিন আগেই বলেছিলেন ভারতবর্ষের নদীগুলির স্বার্থকে সুরক্ষিত করতে একটি পরিকল্পনার প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর আমরা অনেক পথ হেঁটেছি, নদীকে টুকরো করার ইতিহাসকে আমরা প্রলম্বিত করেছি, কিন্তু নদীগুলির বাস্তুতন্ত্র সমীক্ষা কখনোই করিনি। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হয় নতুন কাল নতুন অর্ঘ্য দাবি করে। যারা জোগান বন্ধ করে দেয় তারা বরখাস্ত হয়। পরিবেশ নিয়ে আলোচনার জগতে নদী, জঙ্গল, পাহাড় সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদের স্থিতিশীল পরিকল্পনা ও সমীক্ষা আজকের পরিস্থিতি দাবি করে। প্রকৃতিকে অতিক্রম কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তারপর আসে বিনাশের পালা।